30 MAR 2016

কালের কণ্ঠ

সৈয়দ ফারুক হোসেন ▷

উচ্চশিক্ষায় ভর্তিযুদ্ধ ও বাস্তবতা

বর্তমান সরকার দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছে। এ ঘোষণার বাস্তবায়ন ঘটলে দেশের উচ্চশিক্ষার সংকট অনেকাংশে কেটে যাবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংকট উত্তরণের জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জমি ও অবকাঠামোর দিক থেকে যে সুবিধা ভোগ করছে, তাকে কাজে লাগিয়েই উচ্চশিক্ষায় ভর্তি সংকট অনেকটা দূর করা সম্ভব। যারা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা মেডিক্যাল কলেজ অথবা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে না, তাদের জন্য কারিগরি শিক্ষার জগৎ খুলে দেওয়া যায়; এতে দক্ষ ও প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ তৈরির প্রাথমিক কাজটি অন্তত সম্পন্ন করা সম্ভব

শিক্ষা হলো সভ্যতার রূপায়ণ। যেকোনো জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটে উচ্চশিক্ষার হাত ধরে। উচ্চশিক্ষাই নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে জ্ঞানের আলোয় জাতিকে উদ্ভাসিত করে এবং সেই সঙ্গে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলে। উচ্চশিক্ষা প্রতিটি নাগরিকের অধিকার। আর এ অধিকারের প্রতি সম্মান দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

এ উপমহাদেশে উচ্চশিক্ষার ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, ব্রিটিশ শাসিত ভারতে ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উচ্চশিক্ষার পাদপীঠ তখন ছিল মুষ্টিমেয় উচ্চবিত্ত জনগণের আয়ত্তে। উচ্চশিক্ষার চূড়াটা ছিল ছোট। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া মানে অনেক অর্থ ও মেধার প্রয়োজন হতো। ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট প্রবর্তনের সময় ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ হাতে গোনা চারটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বর্তমানে ৩৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি ৭৫টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। যদিও অনুমোদিত ৮০টি, পাঁচটির একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়নি (ইউজিসি রিপোর্ট ২০১৪)। বর্তমানে আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মূলত পাঁচ ধরনের—যথা ১. সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, ২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ৩. ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ৪. কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৫. টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়।

একজন শিক্ষার্থী বুকে ধারণ করা স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পেরিয়ে উচ্চশিক্ষার দ্বারস্থ হয়। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকের স্বপ্ন ভিন্ন। সমাজ বাস্তবতায় কেউ হতে চান ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার কেউবা আবার শিক্ষক। উচ্চশিক্ষাপ্রত্যাশী মেধাবী এসব শিক্ষার্থীর স্বপ্নপূরণের প্রথম ধাপ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা। ভর্তি পরীক্ষায় তীব্র প্রতিযোগিতায় নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করে কেবল কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আসন সংকটের কারণে বহু শিক্ষার্থীর স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে না। ২০১৫ সালে এইচএসসি উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সাত লাখ ৩৮ হাজার ৮৭২ জন। মোট জিপিএ ৫ পেয়েছে ৪২ হাজার ৮৯৪ জন। যদিও গত কয়েক বছরের মধ্যে ২০১৫ সালের এ পাসের হার ছিল কম। এদিকে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সর্বশেষ ২০১৪ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত ৩৩টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে আসন সংখ্যা ৪০ হাজার ৭২৭টি। এটাও ঠিক যে সাত লাখ ৩৮ হাজার ৮৭২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সবার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্যতা নেই। কিন্তু ভালো ফলসম্পন্ন অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীই এই ৩৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে না। আর এ কারণে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধে আমাদের মেধাবী শিক্ষার্থীরা নাকাল হয়ে পড়ে। তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়।

যারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না, তাদের স্থান হয় জাতীয় ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিক্ষার্থীদের অনুপাতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা যথেষ্ট কি না তা স্পষ্ট করে বলা যায় না।

বর্তমান সরকার দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছে। এ ঘোষণার বাস্তবায়ন ঘটলে দেশের উচ্চশিক্ষার সংকট অনেকাংশে কেটে যাবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংকট উত্তরণের জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জমি ও অবকাঠামোর দিক থেকে যে সুবিধা ভোগ করছে, তাকে কাজে লাগিয়েই উচ্চশিক্ষায় ভর্তি সংকট অনেকটা দূর করা সম্ভব। যারা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা মেডিক্যাল কলেজ অথবা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে না, তাদের জন্য কারিগরি শিক্ষার জগৎ খুলে দেওয়া যায়; এতে দক্ষ ও প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ তৈরির প্রাথমিক কাজটি অন্তত সম্পন্ন করা সম্ভব। মানবসম্পদ রপ্তানির জন্য এ পদক্ষেপ হতে পারে বেশ ফলপ্রসূ। প্রযুক্তিবিদ্যায় ডিগ্রি অর্জন করে জনশক্তি দেশ-বিদেশের চাহিদা পূরণ করতে পারবে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ডবল শিফট চালু করতে হবে। কেননা অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে দুপুরের পর ক্লাস থাকে না। তাই এ সময়টা ব্যবহার করা যায়। প্রয়োজনে ভিন্ন ব্যবস্থাপনায় এ দ্বিতীয় শিফট পরিচালিত হতে পারে। দ্বিতীয় শিফটের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষকও নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্রুত শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

জায়গা ও অবকাঠামোর দিক থেকে বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আসন সংখ্যা আরো বাড়ানো যেতে পারে। যেমন—জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিভাগে যেখানে ১০০ শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়, সেখানে আরো ৫০ জন শিক্ষার্থী বেশি ভর্তি করানো যেতে পারে।

এ ছাড়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো নতুন নতুন বিভাগ খোলা যেতে পারে। উন্নত দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকালে দেখা যায়, সেখানে সমসাময়িক চাহিদা অনুযায়ী নিত্যনতুন বিষয় পড়ানো হচ্ছে। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ব্যবস্থার ধাঁচ পরিবর্তন করে সেখানে আরো ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা যেতে পারে।

গাজীপুরস্থ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসে অবকাঠামো সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ক্যাম্পাসে অনার্স পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা যায়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনও তা অনুমোদন করে। কলেজগুলো দেশে উচ্চশিক্ষা সংকট নিরসনে ভূমিকা রাখতে পারে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কলেজগুলোতে যথাযথ শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে হবে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি করে ক্যাম্পাস রয়েছে। প্রয়োজনে সরকার দ্বিতীয় একটি ক্যাম্পাস চালু করে সেখানে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করতে পারে। যেমন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় একটি ক্যাম্পাস গাজীপুর অথবা ঢাকা বিভাগের যেকোনো একটি জায়গায় চালু করা যেতে পারে। সরকার এ ক্ষেত্রে খাস জমি ও অবকাঠামো নির্মাণে সহায়তা দিলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একাডেমিক বিষয়গুলো চালিয়ে নিতে পারে। ঠিক তেমনি পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস বরিশাল শহরে কিংবা শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস হবিগঞ্জ বা মৌলভীবাজারে হতে পারে। এতে আরো কিছু শিক্ষার্থী পড়াশোনার সুযোগ পাবে।

দেশে বর্তমানে বেশ কয়েকটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রয়েছে। একটি মাত্র গ্লাস ও সিরামিক ইনস্টিটিউট ও চারটি টেক্সটাইল কলেজ রয়েছে। এ দুটি ক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার সুযোগ আরো বাড়ানো প্রয়োজন। তেমনি প্রয়োজন লেদার টেকনোলজি শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো। উন্নত দেশে এসব বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার সুযোগ অনেক। আমাদের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্যও পেশাগত বিদ্যায় জীবিকা গড়ে তোলার এ সুযোগগুলো আরো অনেক বাড়াতে হবে।

আধুনিক প্রযুক্তিগুলোর বেশ কিছু ক্ষেত্র রয়েছে, যাতে আমাদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। টেক্সটাইল ও পলিমার টেকনোলজি সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এসব বিষয়ে উচ্চতর গবেষণার অনেক সুযোগ রয়েছে। আমাদের নিজস্ব সম্পদ পাট ও অন্যান্য ফাইবারের উন্নয়ন ও ব্যবহার যোগ্যতা বাড়ানোর জন্য শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। খনিজবিজ্ঞান ও খনিজদ্রব্য উন্নয়ন প্রযুক্তিবিদ্যা একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের অধীনে এ ক্ষেত্রে উচ্চতর গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সমুদ্রবিজ্ঞান বিষয়ের ওপর লেখাপড়াও অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে।

উচ্চশিক্ষার সংকট সমাধানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উত্তম সমাধান হতে পারে। সঠিক ব্যবস্থাপনা ও দিকনির্দেশনায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আরো সচেতন ও তৎপর হলে উচ্চশিক্ষার অন্যতম একটি ক্ষেত্র হতে পারত। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সব সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিত করতে হবে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় ভৌত কাঠামো তৈরি ও শিক্ষার পরিবেশ রক্ষা করা জরুরি। মানবসম্পদ উন্নয়নে উচ্চশিক্ষার কেবল সুযোগ সৃষ্টি করলেই হবে না। বরং যথাযথ মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমান বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তালিকায় বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নেই। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মাপকাঠি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, মানসম্মত পাঠ্যপুস্তকের প্রাপ্যতা, শিক্ষা খাতে জিডিপির বরাদ্দের অনুপাত, গবেষণা কার্যক্রমের অবস্থা, উচ্চশিক্ষায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও দক্ষতার প্রয়োগ, শিক্ষাব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার, উচ্চশিক্ষার হার ও মান, বাধ্যতামূলক শিক্ষার মেয়াদ, বয়স্ক শিক্ষা, সাক্ষরতার হার ইত্যাদি। আমাদের উচ্চশিক্ষায় সব দিক থেকে এসব বাড়াতে হবে।

বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষার বাতায়ন সবার জন্য উন্মুক্ত হোক—এ লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির অন্যতম নিয়ামক হিসেবে শিক্ষাকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া এখন সময়ের দাবি।

লেখক : উপ-রেজিস্ট্রার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়